সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি	১–১৪
দ্বিতীয়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ	১৫–২৯
তৃতীয়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন	৩০–৪৪
চতুর্থ	আন্দোলন ও সংগ্রামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৪৫–৫৯
পঞ্চম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান	৬০–৬৯
ষষ্ঠ	জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৭০–৮৪

২০১৮

প্রথম অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম এবং আচার-প্রথা-পদ্ধতি অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ তাদের এই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব কমই জানে। এমনকি পরস্পরের জানা-শোনার পরিধিও যথেষ্ট নয়। ফলে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা জীবনযাপন পদ্ধতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি আজ হুমকির মুখে। তাদের প্রচলিত ছড়া, রূপকথা, মৌখিক সাহিত্য, সংগীত, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এমনকি খেলাধুলাও হারিয়ে যাওয়ার পথে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয় সম্পর্কে জানব।

চিত্র- ১.১: পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষের দৃশ্য।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংস্কৃতির রূপ বর্ণনা করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গল্প ও লোককাহিনী, লোকগীতি, ছড়া, রূপকথা এবং সংগীতের বিবরণ দিতে পারব;
- বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ দিতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খেলাধুলার বিবরণ দিতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশেষ খেলাধুলার সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব;
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এবং তাদের বৈচিত্র্য সংস্কৃতির দিকসমূহ জানতে আগ্রহী হব ;
- ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংগীতের নান্দনিক দিক উপভোগ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ০১: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য

আমরা জানি, ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের বাহনই নয়, সেই ভাষা দিয়ে মানুষ তার সৃজনশীল কাজের দৃষ্টান্তও রেখে যায়। আর সাহিত্য হচ্ছে সেই সৃজনশীল কাজের নিদর্শন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকের যেমন রয়েছে নিজস্ব ভাষা তেমনি রয়েছে সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য। তবে অনেকেরই আবার লিপি না থাকার কারণে সেসব সাহিত্য শুধু মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে দীর্ঘকাল থেকে। মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে ছড়া যেমন প্রাচীন তেমনি রূপকথাও। এ ছাড়াও লোককাহিনী প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা ঐ জনগোষ্ঠীর প্রাচীন মানুষের মুখে মুখে গল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। একালে আমরা লোকসাহিত্যের নানা লিখিত রূপ পেলেও এক সময় তা ছিল না।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই ছড়া, রূপকথা, লোককাহিনি প্রভৃতি রয়েছে। সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, ওরাঁও, মান্দি, ত্রিপুরা, মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া, পাঙন ও খাসিসহ সবারই নিজস্ব ঐতিহ্য এবং জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্য অর্থাৎ ছড়া, রূপকথা, লোককাহিনি, সংগীত প্রভৃতি রয়েছে। তবে চর্চার অভাবে এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্য তেমন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। এক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় চাকমা ভাষায় রচিত সাহিত্য বিশেষ করে গল্প-কবিতা কিছুটা হলেও চর্চার সুযোগ পেয়েছে। এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সংখ্যায় খুবই কম সেই খুমি, পাংখোয়া, ম্রো, লুসাই, পাত্র, পাহান, মাহালী, মালো, মুন্ডা, ডালুসহ অন্যান্যদের লোকসাহিত্য এতই সমৃদ্ধ যে, এগুলো পাঠ করলে বিস্ময় জাগে। ভাষা ও ঐতিহ্যের বিচারে প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	মানুষের সৃজনশীল কাজের নিদর্শন কী?
কাজ- ২:	রূপকথা ও লোককাহিনি কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল?

পাঠ- ০২: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রূপকথা

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিছু প্রচলিত ছড়া ও রূপকথা থাকে। যা মূলত তারা দীর্ঘদিন ধরে বংশপরম্পরায় বহন করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে তাদের জীবনাচরণের অনেক কিছুরই প্রতিফলন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়া,প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে। তবে অনেকের লিখিত সাহিত্য না থাকায় অনেক রূপকথাই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রূপকথাগুলো মূলত তাদের জাতি সৃষ্টির ইতিহাস, পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস, প্রকৃতি গাছ-পালা, চন্দ্র সূর্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে একটি খুমি রূপকথা তুলে দেওয়া হলো-

কচ্ছপের গল্প (ইউকিই আচি): এক বনে এক কচ্ছপ বাস করত। একদিন ঐ বনে একদল বানর গাছে বসে কালোজাম খাচ্ছিল। কচ্ছপটি গাছের নিচে ঝরে পড়া জাম খুঁজছিল। দুষ্টু বানরদল কচ্ছপটিকে দেখে তাকে তুলে গাছের ডালে আটকিয়ে রাখে। এরপর বানরগুলো পালিয়ে যায়। ডালে আটকে থেকে কচ্ছপটি কান্নাকাটি করতে লাগল। তার চোখের জলে গাছের নিচে কাদা হলো। একদিন এক শূকর সেখানে স্নান

করতে এলো। কচ্ছপটি ধুম করে শূকরটির উপর পড়লো। শূকরটি মরে গেল। কচ্ছপটি তখন শূকরটির দাঁত দিয়ে একটি বাঁশি বানাল আর সকাল-সন্ধ্যা সেটি বাজাতে লাগল। বাঁশির সুর শুনে মাটির গর্ত থেকে এক ইঁদুর বেরিয়ে এলো। ইঁদুরটি বাঁশিটি বাজাতে চেয়ে কচ্ছপের কাছ থেকে নিয়ে মাটির গর্তে ঢুকে গেল। মনের দুঃখে কচ্ছপটি কাঁদতে লাগল। তার সে কান্না শুনে গাছের উপর থেকে ডিমে তা দিতে থাকা গোখরা সাপ নিচে নেমে এলো। কচ্ছপ তাকে তার দুঃখের কথা বলল।

সাপটি তখনই কচ্ছপকে তার ডিমে তা দিতে বলে বাঁশি আনতে মাটির গর্তে গেল। কচ্ছপ ডিমে তা দিচ্ছে, তখন দুইটি শ্যামা পাখি এসে নড়ে চড়ে তা দিতে বললে কচ্ছপ তা করল ফলে সাপের ডিম ভেঙে গেল। কচ্ছপ আবার কান্না শুরু করল। সাপটি বাঁশি নিয়ে ফিরে এলে সে তাকে শ্যামা পাখির দুষ্টু বুদ্ধির কথা বলল। সাপটি তাকে বাঁশিটি ফিরিয়ে দিয়ে রাগে-দুঃখে শ্যামা পাখির উপর প্রতিশোধ নিতে নদীর ধারে অপেক্ষায় রইল। একদিন পাখি দুটি নদীতে পানি পান করতে এলে ছোবল মেরে সাপটি প্রতিশোধ নিল।

অনুশীলন	
কাজ-১ ঃ	রূপকথায় কিসের প্রতিফলন ঘটে?
কাজ-২ ঃ	ইউকিই আচি বা কচ্ছপের গল্পের মূলভাব লেখ।

পাঠ- ০৩: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছড়া

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরই নিজস্ব ছড়া রয়েছে। এগুলো খুবই সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যময়। ছড়ার মধ্যে ঘুম পাড়ানি ছড়া প্রায় সব জাতিরই রয়েছে। এখানে বাংলা অর্থসহ মান্দিদের একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া উল্লেখ করা হলো:

মান্দিদের (গারো) আচিক ভাষা	বাংলা ভাষায় অনুবাদ
কুইনি ননো কুইয়ি	ঘুমা খুকী ঘুমা
কাংখি মি সয়েং' আ	কাঁকড়া বসলো রান্নায়
শিরু চি কয়েং আ	শালিক পানি তুলতে যায়
কুইনি ননো কুইয়ি!!	ঘুমা খুকী ঘুমা।
মাম বক্কা চানান্দে	সরু চালের ভাত খাবে
দ-চি বক্কা চানান্দে	তাজা সাদা ডিম পাবে
কুইনি ননো কুইনি!!	ঘুমা খুকী ঘুমা।
জাওয়া বা-ত্র খাতুনোয়া	দস্যি ধরে নিবে যে
মাংখাওয়ী চিকনোয়া	দৈত্য ছিড়ে খাবে যে
কুইনি নগে কুইয়ি!!	ঘুমা খুকী ঘুমা।

ত্রিপুরাদের ককবোরক ভাষায় শিশু আদরের একটি ছড়া দেওয়া হলো। আকাশের বুকে যখন চাঁদ উঠে তখন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে বাঁশবনে। তখন ছোট্ট শিশুর গালে আদর সোহাগের চুম্বন একে দিয়ে মা গেয়ে উঠেন–

লামচারি বাই বানাওমানি বাবা কাচাকয়ই
খুতালাই বাই বানাওমানি বাবা কুফুলয়ই
তামা বাথায়নো চাগই ফাইতিহা খোকচি কাচাকয়ই
তামা ববারনো কানই ফাইতিহা ইসোক মুতুময়ই।

বাংলা অর্থ– এখানে শিশুকে দেবপুত্র হিসাবে তুলনা করা হয়েছে। খোকন সোনার দেহখানি যেন সোনার টুকরো, চাঁদের মতো দ্যুতিময়। গাল আর ঠোঁট যেন রক্তরঙ কোনো ফলের আবির মাখা। তার সারা শরীরে যেন কোনো বুনো ফুলের সুবাস ভরা।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	মান্দি ছড়াটি কার উদ্দেশে লেখা হয়েছে? তোমার পঠিত কোনো ছড়ার সঙ্গে কি এর মিল আছে?
কাজ- ২:	ত্রিপুরাদের ছড়াটির সারকথা কী? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ০৪ঃ চাকমা লোককাহিনী

সাধেং গিরি অচাই একজন বৈদ্য বা কবিরাজ। তার দুই মেয়ে– কসমতি এবং গোমতি। বাবা নিজের বৈদ্য কাজ নিয়ে গ্রাম-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। দুমেয়ে বাস করে পাহাড়ের জুমে (যেখানে জুম চাষ করা হয়)। তারা অনেক কষ্ট করে সেখানে ফসল ফলায়। অথচ সেখানে থাকার মতো ভালো ঘর নেই। বড় বোন কসমতি তাই আক্ষেপ করে বলে– যে আমাকে জুমঘর বানিয়ে দেবে সে যে-ই হোক আমি তাকে বিয়ে করব। এই কথা যেই না বলা, অমনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো এক বিশাল অজগর সাপ। আর অল্প সময়ের মধ্যেই সে বানিয়ে ফেলল বিশাল এক জুমঘর (চাকমা ভাষায়- গাইরিং)। সেখানে ভাত, তরকারি, আগুন, তামাক, পানি কোনো কিছুরই অভাব নেই। দু'বোন বেশ ভয়ে ভয়ে সে ঘরে ঢুকল। বড় বোন বিয়ে করল সাপকে। এ সাপ যে এক অভিশপ্ত রাজকুমার তা বিয়ের প্রথম রাতেই জানতে পারল কসমতি। অভিশাপের কারণে সে দিনে সাপ আর রাতে মানবদেহ ফিরে পায়।

সুখেই কাটছিল তাদের জীবন। ছোট বোন গোমতি অবশ্য সাপের সঙ্গে এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। একদিন তাদের বাবা এলো জুমঘরে এবং ছোট মেয়ের কাছে সে জানল বড় বোনের বিয়ের গল্প। শুনে তো বাবা রেগে আগুন। বড়বোন ছিল পাশের গ্রামে। দুপুরে সাপরূপী কুমার খেতে এলে বুড়ো বাবা দা দিয়ে এক কোপ দিলে সাপটি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে

চিত্র- ১.২ : বড়বোন বিয়ে করলো অজগর সাপকে...

মারা গেল। বড় বোন কসমতি ফিরে সেই দৃশ্য দেখে বেদনায়-দুঃখে সাপের মৃতদেহ নিয়ে জঙ্গলে গেল। তারপর সেটি পুঁতে ফেললো টিলার উপর পাথরের নিচে। কদিন পর রক্তলাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সে সমাধিস্থল। আর সে টিলা থেকে নামলো দুটি জলের ধারা। একটির নাম লোগাং অন্যটির নাম পুজগাং। এই দুটি পাহাড়ি ছরা বা ছোট জলধারা পার্বত্য পানছড়ি উপজেলা সদরে এখনও রয়েছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	কসমতি কেন সাপটাকে বিয়ে করেছিল?

পাঠ- ০৫: সাঁওতাল লোককাহিনী

এক কৃষকের ঘরে থাকত এক মুরগি আর এক বিড়াল। দুইজনের মধ্যে খুব ভাব। একবার বিড়াল কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেল অন্য জায়গায়। যাওয়ার সময় মুরগিকে বলল, "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি অন্য কোথাও যাবে না, কেউ দেখা করতে এলেও দেখা করবে না, কথাও বলবে না।"

মুরগি যে একা থাকে দুই দিন পরেই এক শিয়াল তা বুঝতে পারল। কাজেই সে মুরগিকে ধরার জন্য বুদ্ধি খুঁজতে লাগল। শিয়াল রাতে এসে মুরগির ঘরের দরজা নাড়তে লাগল আর ফিসফিস করে ডাকতে শুরু করল। মুরগি রাতের বেলায় তার সঙ্গে কথাও বলল না, দরজাও খুলল না। শিয়াল নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

পরদিন শিয়াল অন্য বুদ্ধি আঁটলো। সে কিছু গম আর খুদ এনে মুরগি যে ঘরে থাকে তার চারদিকে ছিটিয়ে দিল। আর সে সামান্য দূরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। মুরগি খাদ্য খাওয়ার লোভে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। কাজেই সে নিশ্চিত মনে খুদ খেতে শুরু করল। শিয়াল এই সুযোগে পিছন থেকে এসে মুরগির গলা কামড়িয়ে ধরল। মুরগি কিছুক্ষণ ছটফট করে মারা গেল।

চিত্র- ১.৩ : পরদিন শিয়াল অন্য বুদ্ধি আঁটলো...

পথে শিয়ালের সঙ্গে দেখা হলো সেই বিড়ালের। বিড়াল বুঝতে পারল এটা তারই সেই প্রিয় মুরগি। কাজেই সে শিয়ালের পিছনে পিছনে গেল এবং সে যে গর্তে থাকে তা দেখে এলো। শিয়াল বাচ্চাদের নিয়ে মুরগিটাকে বেশ আমোদ করে খেয়ে ফেলল।

পরদিন শিয়াল তার দুটো বাচ্চাকে গর্তের মধ্যে রেখে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার সময় বাচ্চা দুটোকে বলে গেল, "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা গর্তের বাইরে যাবে না"। শিয়াল চলে যাওয়ার পর বিড়াল গর্তের কাছে গিয়ে শিয়ালের বাচ্চা দুটোকে ডাকল। কিন্তু বাচ্চারা তার ডাকে কোনো সাড়া দিল না। বিড়াল নিরাশ হয়ে সেদিনের মতো ফিরে গেল।

বিড়াল পরদিন আবার শিয়ালের অনুপস্থিতির সুযোগে তার বাচ্চাদের কাছে গেল। সেদিন সে পায়ে পরল নূপুর, হাতে নিল একটা বড় বস্তা। গর্তের কাছে গিয়ে বিড়াল নূপুর বাজিয়ে নাচতে শুরু করল। নৃত্যের শব্দে শিয়ালের বাচ্চারা আর গর্তের মধ্যে থাকতে পারল না। তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। বিড়াল অল্প

সময়ের মধ্যে শিয়ালের বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। তারপর কৌশলে শিয়ালের বাচ্চাদের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল এবং বস্তার মুখ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে চলে এলো। কিছু সময় পর গর্তে ফিরে শিয়াল দেখল তার বাচ্চারা নেই। সে তখন বুঝতে পারল নিশ্চয় বিড়ালই তার বাচ্চাদের নিয়ে গেছে। বাচ্চাদের শোকে শিয়াল কাঁদতে লাগল।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বিড়াল শিয়ালের বাচ্চা দুটোকে কেন ধরে এনেছিল?

পাঠ- ০৬ ও ০৭: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এগুলো তারা দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় চর্চা করে থাকেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের প্রধান দিক এটি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে ঐতিহ্যময় সংগীত ও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র। এখানে কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও কিছু বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত প্রধানত লোকসংগীত। এটি শুধু জনপ্রিয়ই নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের সরল-সাধারণ জীবনের আলেখ্য। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মান্দিদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংগীত হচ্ছে 'রে রে'। এটি তাৎক্ষণিক কথা ও সুরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই দক্ষ 'রে রে' কার অনায়াসে এ গান করতে পারেন।

পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমাদের সংগীত অন্যান্যদের মতোই যথেষ্ট সমৃদ্ধ, বিশেষ করে গ্রাম্য কবিদের রচিত ও পরিবেশিত গান। চাকমা ভাষায় গানকে গীত বলে। যারা এ গান করেন তাদেরকে গেংখুলি বলে। গেংখুলি হচ্ছে চারণকবি বা পালাগানের গায়ক। বিভিন্ন উৎসবে এরা গান করে থাকে। তঞ্চঙ্গারা তাদের নিজস্ব গান বলতে উভাগীতকে বোঝায়, এর আরেক নাম সাপ্পেগীত। উভাগীত-এর সুরে পুরুষ বাঁশি বাজায় আর নারীরা খেংগ্রং নামক বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি এক প্রকার মাউথ-অর্গান বাজায়। চাকমারা নিজেদের ভাষায় বিভিন্ন উৎসব ও শোক-অনুষ্ঠানে গান করে থাকে। গান হচ্ছে- ছিকত্রাং। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতৈ মণিপুরীদের সংস্কৃতির অন্যতম দিক হচ্ছে গান, নাটক ও নৃত্য। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের প্রাণের সংগীত হচ্ছে কীর্তন। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতৈ উভয় সম্প্রদায়ই মণ্ডপে বিভিন্ন পর্ব-উৎসবে গান করে থাকে।

ত্রিপুরাদের সংগীত যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সংগীত বলতে তারা মূলত নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে বোঝায়। ত্রিপুরাদের সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতি ও জীবন-জীবিকার সঙ্গে একাকার হওয়া। এক সময়ে ত্রিপুরার রাজ দরবারে ভারতবর্ষের খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞদের স্থান হয়েছিল। রাজা ধনমানিক্যও ছিলেন কীর্তিমান শিল্পী। একটি ত্রিপুরা ভাষায় দেশাত্মবোধক গান বঙ্গানুবাদসহ দেওয়া হলো :

বাংলা আনি আচাইম:নি-হা	বাংলা আমার জন্মভূমি দেশ
বাংলা আনি আচাইম:নি-হা	বাংলা আমার জন্মভূমি দেশ
বাংলা আনি স্বাধীন খাইম:হা	বাংলা আমার স্বাধীন একটি দেশ
বাংলা আনি খ:ফুম:নি	বাংলা আমার প্রাণের প্রিয় দেশ
কচাংফ: কচাংয়া তুংফ: তুংয়া	গরমও নয় ঠান্ডাও নয়, মনের মতো দেশ
তংথাওম:নি হা চামুং কপুংহা	থাকতে যেমন ভালো লাগে
নাই থাওম:নিহা।।	দৃশ্যও তেমনি মনোহরা।।
র:নি হাবা: বাই র:নি নোবা: বাই	শস্য ভরা আমার এই দেশ, এখানেতে আলো বাতাস
বাংলা আমা আংন আ:চাই রৈ মি:	বাংলা মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন
বাংলা হামা:ন কংয়ে মাঁতং ঐ।।	আমি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই নতশিরে।।
আ:রু বাই তাংমুং তৈমুং বাই	এদেশেতে যেমন ঋতু,
বাওহা খাইয়ে মিলি তং ঐ	খাদ্যশস্য তেমন দিত
বাংলা হামা:লে মখানি আরুদৈ	বাংলা আমার মনের রুচির দেশ
চুংম:নি আ:রুদৈ।।	বাংলা আমার মনের মতো দেশ।।

মারমাদের সংগীত ও গীতিনাট্যের ধারা বেশ প্রাচীন। এগুলো বেশ কয়েকটি ধারায় বিভক্ত। যেমন- কাপ্যা, চাগায়াং, সাখ্রাং, লাঙা, লুংদি প্রভৃতি। এখানে সাম্প্রতিক সময়ের একটি মারমা দেশাত্ববোধক গান বাংলা অনুবাদসহ দেওয়া হলো :

তং জইং পাইরো গা হিবারে	পাহাড় আছে চারিদিকে
তং জইং পাই রো গা হি বা রে	পাহাড় আছে চারিদিকে
রে গে খ্যং কাহ্ রো লখারে	শংখ নদী নেচে গেছে
তং খ্যং স্রং ছিহ্ পাইরো হিরে	নদী-নালা-ঝরণা গান করে
রোয়াদস্রোহ্ সায়া হলো বা রে।	সবুজ এই বান্দরবানে।
বাংলাদেশ অক্যোয়াইরো প্রে ফ্রইতে	মোদের দেশ বাংলাদেশ
দে প্রেমা ইখ্যাই নিহ্ গাইতে	সুখে-দুঃখে আছি মিশে
লুগ্রি লুঙে চু: রো পং রো	হাতে হাত রাখি সকলে
দে প্রে গো হলো য়ং লোককাইমে।।	দেশের উন্নতির কাজে।।
ঙাঁকসে আসাইং গা নিং থোয়কতে	পাখির ডাকে সূর্য উঠে
স্রাক্ পাংতি ঙোয়েরং তক্নিরে	ঘাসগুলো রূপালি সাজে
দে প্রে লু: চইক খইং মারে	রক্ষা করব এ দেশের মান
যাখা মোছে আসাক্কো চোয়েং নৃথইরে।।	যায় যদি যাক প্রাণ।।

ওরাঁওদের বড় উৎসব হচ্ছে কারাম। সে উৎসবে তারা একটি গান করে– ভাই হারানোর গান, বেদনার গান। এখানে সাদরি ভাষার এ গানটি দেওয়া হলো-

খুদিয়াই চুনিয়াই পোষালা ভাইয়ারে
ভাইয়া মোরা গেলেই পরদেশা
একে গোটা পিতারকা ভাইয়ারে
ভাইয়া মোরা গেলেই পরদেশা।
আনাহু পাইব ধানাহু পাইব
পিঠাসানা ভাইয়া কাহা পাইব হো
কানাকা সোনাওয়া পিতারকা ভাইয়ারে
ভাইয়া মোরা গেলেই পরদেশা হো...।

ভাবার্থ: চালের খুদ দিয়ে ভালোবেসে কত কষ্ট করে মানুষ করেছি আমার ভাইটাকে, সে ভাই আজ অন্যদেশে গেল। পিতলের মতো একটাই আমার ভাই। ধান, চাল, টাকা, পয়সা সবই পাবো কিন্তু কানের সোনার মতো মায়ের পেটের যে ভাই দেশ ছেড়ে গেল তারে কোথায় পাই?

বাদ্যযন্ত্র: ওরাঁওরা নাচ-গান-বাজনার প্রতি খুবই আগ্রহী। তাঁদের সমাজের অধিকাংশ পরিবারেই সংগীত পরিবেশন এবং নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সংরক্ষণ লক্ষ করা যায়। এঁরা সাধারণত নিজ হাতে তৈরি করে এসব বাদ্যযন্ত্র এবং এগুলো বৈচিত্র্যময়। এদেশের প্রায় সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ হাতে তৈরি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। ওরাঁও সমাজে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢোল, মাদল, বাঁশি, তাল, নাগারা, খঞ্জনী, ঘুটুর প্রভৃতি। এগুলো সাধারণত এরা বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য বছরের অন্যান্য সময়েও ওরাঁওরা নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে তবলা ও হারমোনিয়ামও ব্যবহার করে থাকে।

চিত্র-১.৪ : পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের বাদ্যযন্ত্র।

পাংখোরা বেশকিছু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এগুলো তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। সিয়াল রাকি (গয়ালের সিং), ডারসন (পিতলের ঘন্টা), ডারপুই (বড় ঘন্টা), খোয়াং (গাছের কাঠের তৈরি ঢোল), রুয়া খোয়াং (বাঁশের ঢোল) এবং থেই খাং (কৌটার আকৃতি বাঁশের বাদ্যযন্ত্র)। চাকমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-ধুদুক, হেঙগরঙ, শিঙা, বাঁশি, ডগর, সারিন্দা, তাক প্রভৃতি। রাখাইন-মারমাদের মধ্যে অনেক ধরনের ঢোলের প্রচলন রয়েছে। যেমন– ছেইন-ওয়েইন বা গোলাকার ঢোল, ক্যে-ওয়েইন বা পেটা ঘড়ির আকৃতির ঢোল, পেট-মাহ সবচেয়ে বড় ঢোল প্রভৃতি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	'রে রে' সংগীত কাদের? এটি কীভাবে করা হয়?
কাজ- ২:	উভাগীত ও খেংগ্রং কী?

পাঠ- ০৮ ও ০৯: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ

যেকোনো নৃগোষ্ঠীর মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পোশাক থাকে। বাংলাদেশের সব নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাক। নানা বর্ণ নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে এসব নৃগোষ্ঠীর পোশাকসমূহ খুবই আকর্ষণীয়। একদিকে যেমন প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জীবনে এরা সাধারণ পোশাক পরে আবার বিভিন্ন উৎসবে এরা ঐতিহ্যময় পোশাক পরিধান করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা নিজেরাই পোশাক তৈরি করে থাকে। তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণিল পোশাক গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা পার্বত্য জেলায় বেড়াতে গেলে চাকমা, তঞ্চঙ্গা, মারমা, ত্রিপুরাদের নানা বর্ণের চমৎকার সব নিজেদের তৈরি পোশাক যেমন দেখতে পাবে তেমনি সিলেটে গেলে মণিপুরী ও খাসিদের নানা রঙের এবং নকশাদার পোশাক তোমাকে মুগ্ধ করবে। এখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাকের বর্ণনা ও ছবি দেওয়া হলো।

খেয়াং, খুমি ও চাক পোশাক: খেয়াংদের নিজস্ব পোশাক রয়েছে। তাদের বুননকৃত পোশাক বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক দেখতে অনেকটা রাখাইনদের মতো মনে হলেও থামিকে এরা প্যওন বলে এবং বক্ষবন্ধনীকে লাংগত বলে। খেয়াং পুরুষ নেংটি এবং হাতে সেলাইকরা জামা পরে। বাইরে যাবার সময় তারা মাথায় পাগড়িও পরে।

খুমিরা থামিকে নেনা বলে। এটি নানা রঙে নকশা করা। মহিলারা পাগড়ি পরে, ছেলেরা নেংটি এবং লুঙ্গি। চাকদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে পাংহে কামুহ বা নয়হাতি ধুতি। বর্তমান এটি প্রায় বিলুপ্ত। এর পরিবর্তে লুঙ্গি ব্যবহার করে। ব্লাউজকে এরা বলে 'রাইকাইন পে'।

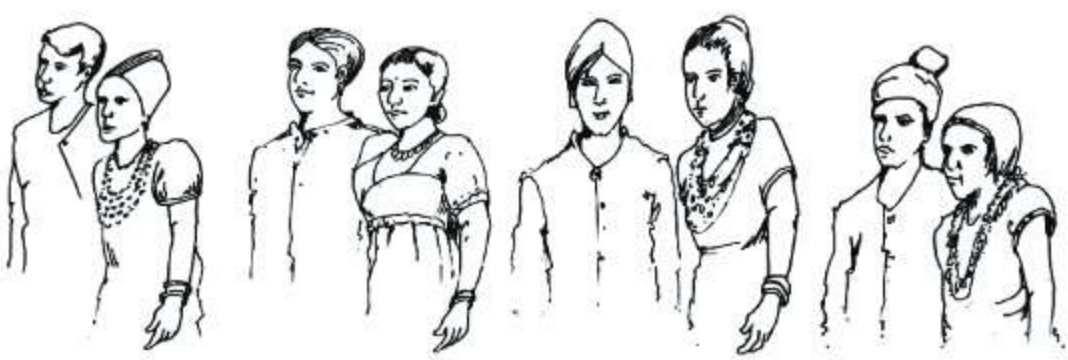

চিত্র-১.৫ : ত্রিপুরা, খেয়াং, চাকমা ও তঞ্চঙ্গাদের পোশাকের ছবি

চাকমা ও তঞ্চঙ্গা: হাতে বোনা বা তৈরি ঐতিহ্যময় তাঁত কাপড়ের জন্য চাকমা ও তঞ্চঙ্গারা বিখ্যাত। বেইন নামে কোমর তাঁতের মাধ্যমে নারীরা কাপড় তৈরি করে। চাকমা নারীদের উল্লেখযোগ্য পোশাক হচ্ছে পিনুন, খাদি কানাই, খবং প্রভৃতি।

তঞ্চঙ্গা নারীদের পোশাকের নাম পিনুন। এটি কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রঙিন এবং দৈর্ঘ্য ৪ হাত। দেখতে রংধনুর মতো। চাকমা মহিলাদের পিনুনের মতো তঞ্চঙ্গা পিনুনের দুই প্রান্ত আনুভূমিক ভাবে কালো ও ভেতরের দিকে লাল রঙের মাঝখানে লাল ও হলদে একই মাপের দুই সীমান্ত থাকে। লাল সবুজ, বেগুনি, আকাশি প্রভৃতি রং মিশ্রিত জমিনও থাকে। কিন্তু চাকমাদের পিনুনের মতো উলম্ব (উপর ও নিচে) কোন চাবুগি থাকে না।

সবচেয়ে মজার বিষয় তঞ্চঙ্গাদের কোন গসা বা গোত্র কী পোশাক পরবে তা ঠিক করা আছে। যেমন: কারওয়াসা গসা পিনুন, খাদি, ফারর দুরি, মাথার খবং, সাদা কোবোই সালুম প্রভৃতি। অন্যদিকে মুঅ গসা- পিনুন, খাদি, কালো কোবোই, ব্লাউজ প্রভৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ত্রিপুরাদের পোশাকও খুবই আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়। ত্রিপুরা মেয়েরা কোমরে পরার জন্য যে তাঁত কাপড় তৈরি করে তার উপরের অংশের নাম রিসাই এবং নিচের অংশের নাম রিনাই।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মান্দি পুরুষরা গান্দো, পান্ত্রা, জামা, কাদি বা কটিপ এবং মেয়েরা রেকিং, জারন, আনপান, কপিং প্রভৃতি ব্যবহার করে। এক সময়ে হাজং নারীরা নিজেদের তাঁতের তৈরি লাল ও কালো ডোরার পাঁচহাত লম্বা ৩ হাত প্রস্থের যে কাপড় পরত তার নাম পাতিন। এটি এখন প্রায় লুপ্ত।

মারমা পুরুষগণ ধুতির মতো তাঁতে বোনা 'ধেয়ার' এবং এর সাথে জ্যাকেটের মতো 'ব্যারিস্টা আঙ্গি' জামার উপর পরে। তবে লুঙ্গির প্রচলনও রয়েছে। নারীরা 'বেদাইত আঙ্গি' নামের ব্লাউজ পরিধান করে থাকে। এক সময় সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছিল পুরুষের পানচি (ধুতি ছোট করে পরা) এবং নারীদের পানচি-পাড়হান্ড নামের দু খণ্ড মোটা কাপড়। এখন আর এ পোশাক তেমন ব্যবহার হয় না বরং পুরুষ ধুতি ও লুঙ্গি এবং নারীরা শাড়ি পরে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওরাঁওদের পোশাক সাঁওতালদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। খাসি পুরুষরা এক সময় তাদের ঐতিহ্যবাহী কোট, পাগড়ি, ধুতি মোঙ্গল পরিধান করত। অন্যদিকে নারীরা তাদের কাঁধের পাশে যে ঐতিহ্যময় পোশাক পরে তাকে 'জাংকুবাস' বলে– এটি ঝুলে থাকে।

মণিপুরী নারীদের পোশাকও কম ঐতিহ্যময় নয়। মণিপুরী তাঁতের তৈরি পোশাক খুবই বিখ্যাত। চাকচাবি, ইনাফি, আঙ্গলুরি, চমকির আহিং, ইরুফি, খাংচেৎ প্রভৃতি। আর পুরুষদের পোশাক হচ্ছে- কেইচুম, খুত্তেই কয়েত। মণিপুরীদের পোশাকেও নিজস্ব শিল্প নৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমতলে বসবাস করেন তাদের অধিকাংশেরই পোশাক পুরুষদের লুঙ্গি, ধুতি, জামা, পাঞ্জাবি ফতুয়া এবং নারীদের শাড়ি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য জেলায় বেড়াতে গেলে কাদের কাদের ঐতিহ্যময় পোশাক দেখতে পাবে?
কাজ- ২:	হাজং নারীদের কোন পোশাকটি এখন প্রায় লুপ্ত?

পাঠ- ১০ ও ১১: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাহাড়িয়ারা এক সময় বন জঙ্গল নদী-নালার উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তারা শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করত। ঐ সময় খরগোশ, কুচে এবং শামুক তাদের পছন্দের খাবার ছিল কিন্তু বর্তমানে খুব একটা দেখা যায় না। বর্তমানে ভাত মাছ, ডাল, সবজি প্রভৃতি অন্য সকলের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরও সাধারণ খাবার। চালের গুড়ার তৈরি নানা প্রকার পিঠা ওরাঁওদের ঐতিহ্যময় খাবার। বাঙালিদের পিঠার সঙ্গে এগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে। মুড়ি, মুড়কি নাড়ু মোয়াতো রয়েছেই। কোল, গন্ড, তুরি পাহান, বাগদি, মাহাতো, মাহালী, ভূমিজ, মালো, মুন্ডা, রাজোয়াড়, সাঁওতাল প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মানুষের খাদ্যাভ্যাস ওরাঁওদের অনুরূপ। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে কেউ হয়তো কোনো কোনো বিশেষ খাবার গ্রহণ করেন না। যেমন তুরিসহ অনেকেই গরুর মাংস খান না। তবে এদের অনেকেই ভাত হতে এক প্রকার পানীয় তৈরি করে যার নাম হাঁড়িয়া। বিভিন্ন উৎসব, পার্বণে ও বিয়ের অনুষ্ঠানে এই হাঁড়িয়া পান করা হয়।

বর্মন, বানাই, হাজং, ডালু এবং কোচসহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের প্রতিদিনের সাধারণ খাবারের তালিকায় রয়েছে ভাত, মাছ, মাংস ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের রান্নার প্রক্রিয়ায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। আবার উৎসব অনুষ্ঠানের খাবারও আলাদা হয়ে থাকে। মান্দিদের অন্যতম খাবার হচ্ছে বিন্নি চালের ভাত মিমিল, গুলথুমমাম্থি, গানথং মাম্থি, মেগারুজওয়া, মেখপ বিৎতা, খিওয়েক খারি, সথুপা, খাপ্পা, মিব্রাম, নাখাম প্রভৃতি।

পাত্রারা 'পাচুবেন' নামে একটি প্রিয় খাবার খেয়ে থাকে যা মূলত মাছ ও চাপা শুঁটকি দিয়ে রান্না করা এক ধরনের স্যুপ। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মণিপুরীদের অধিকাংশই নিরামিষ ভোজী। অনুষ্ঠানাদিতে দই, চিড়া, খই এর প্রচলন রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে। খাদ্য তালিকায় শাক, সবজি ও ফল তাদের কাছে পছন্দের। রাখাইনদের প্রিয় খাবার বিন্নিভাত এবং ছোট ছোট চিংড়ি মাছের তৈরি নাপ্পি।

সাঁওতালদের প্রতিদিনের সাধারণ খাবারের তালিকা অনেকটা বাঙালিদের মতোই। তবে ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগি এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে হরিণ, খরগোশ ও কিছু পাখির মাংস খেয়ে থাকে। পাহাড়ের প্রায় সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরই খাদ্যতালিকায় সাধারণ খাবার হচ্ছে ছোট ছোট চিংড়ি মাছের তৈরি নাপ্পি। এছাড়া খেয়াং বা খুমিরা বন্যপ্রাণী শিকার করলে তার মাংস শুকিয়ে রাখে এবং তা পরে খায়। একাধিক পদের সবজি মাছ অথবা মাংসসহ টক-ঝাল মিশিয়ে তৈরি হয় 'কাইংরাবুং' যা চাকদের ঐতিহ্যবাহী খাবার। শুঁটকি, সিদ্ধ তরকারি, মরিচবাটা ঐতিহ্যবাহী খাবার। সিদ্ধ তরকারিকে 'উসুনা চন' বলে।

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে রান্না করা খাদ্য ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি অতিথিদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। রান্নার পদ্ধতির মধ্যে উচ্যা, সিক্যা, হলা গুদেয়্যা, কেবাং, গরাঙ, কোরবো উল্লেখযোগ্য। কোনো তরকারি সেদ্ধ করে খাওয়াকে উচ্যা বলা হয়। প্রধানত শাক-সবজিই সেদ্ধ করে খাওয়া হয়। সিক্যা হচ্ছে লবণ, হলুদ আর মরিচ মিশিয়ে মাংসখণ্ড আগুনে সেঁকে খাওয়া।

'হলা' হলো কম ঝোল দিয়ে মাছ-মাংস রান্না করা। ধাতব কোনো পাত্রে বা বাঁশের চোঙায় মরিচের পরিমাণ বেশি দিয়ে মিশ্রিত বা চূর্ণ করে প্রস্তুতকৃত কোনো তরকারিকে 'গুদেয়্যা' বলে। কলা পাতা বা অন্যান্য পাতা মুড়িয়ে আগুনে রান্না করা কোনো তরকারিকে 'কেবাং' বলে। পাতা দিয়ে রান্না করা হয় বলে এক বিশেষ সুগন্ধি ও স্বাদ সৃষ্টি হয়। প্রচুর মরিচ আর পেঁয়াজ বা শুঁটকি বা সিদোল মিশিয়ে কোনো শাকসবজি মিশ্রিত করে প্রস্তুত খাদ্য হচ্ছে- 'কোরবো'।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ওরাঁওদের প্রধান প্রধান খাদ্যের নাম লেখ।
কাজ- ২:	পাহাড়ের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর খাদ্যতালিকায় সাধারণ খাবারের নাম কী? কীভাবে তৈরি হয়?

পাঠ- ১২: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খেলাধুলা

এখানে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু খেলাধুলার পরিচয় পাবো। পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি সাধারণ খেলা হচ্ছে গিলা খেলা যা চাকমা, মারমা, পাংখোয়া প্রভৃতি জাতির মানুষ খেলে থাকে। খেয়াংদের মধ্যে 'পত্তবলী' বা মন্ত্রযুদ্ধ নামক একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলা প্রচলিত। খুমিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা হচ্ছে 'আথো আচ্ কে'। প্রায় ৫ফুট লম্বা একটি শক্ত বাঁশের দুপ্রান্তে দুই থেকে চার জন মানুষ দাঁড়িয়ে শক্ত করে বগলের নিচে আটকিয়ে একপক্ষ অপর পক্ষকে মাটিতে ফেলার চেষ্টাই হচ্ছে আলো আচ্ কে। যে পক্ষ মাটিতে প্রথমে পড়বে ওরা হারবে। এর আরেক নাম হলো বাঁশ আটকিয়ে শক্তি পরীক্ষা। পাংখোয়াদের উল্লেখযোগ্য খেলাধুলা হচ্ছে-পইকা (ঘিলার খেলা), সাইলেব (কাঠি খেলা), কালচেক বা বাঁশ দিয়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা, এছাড়াও বাঁশ ঘোরানো এবং বেতের বৃত্ত বা রিং খেলা উল্লেখযোগ্য।

মারমারা গিলা খেলাকে বলে দোঃ কজাঃ বোওয়েঃ। এছাড়াও কুস্তি (ক্যাং লুঙ বোওয়েঃ), লুকোচুরি (হোঅক্ তাইঃ) এবং ব্রিঃ দাইঃ বা দৌড় তাদের উল্লেখযোগ্য খেলা। লুসাইদের অধিকাংশ খেলাই শক্তি পরীক্ষামূলক খেলা। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইনুসুত নর। এটি ধাক্কা দিয়ে নাড়ানো একটি খেলা, ঢেকিতে যে লাঠি দিয়ে চাল বানানো হয় তা দিয়ে একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে শক্তিপরীক্ষাই এই খেলার মুল।

মান্দিদের নিজস্ব খেলাধুলার মধ্যে মিসি মেংগং (ইদুর-বিড়াল খেলা), গাং গিসিক্কা (কুস্তি), থুমুয়া (লুকোচুরি), বিনবিন জারি (পা ও আঙ্গুল দিয়ে খেলা), আংখি খেপপা (কাঁকড়া প্যাচের খেলা), চাগ্রিপা (একজনকে ঘেরাও), ওয়াফোং সালা (বাঁশ টানাটানি) প্রভৃতি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বর্মণদের ঐতিহ্যবাহী খেলা হচ্ছে লাঠি খেলা এবং শক্তি পরীক্ষা খেলা। হাজং সমাজের অন্যতম খেলা হচ্ছে-কুক্ কুক্ (খুঁজে বের করা) খেলা, বাঙি পাকা খেলা (পানির মধ্যে বৃত্ত হয়ে ডুব দেওয়া), কাঁকড়া মাও খেলা, নারকোয়াল খেলা (নারকেল ধরার চেষ্টা), পেক খেলা প্রভৃতি।

মৈতৈ মণিপুরীদের সবচেয়ে ঐহিহ্যবাহী খেলা হচ্ছে 'কাংচৈ' যা পরবর্তীকালে 'পোলো' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা এটি এখান থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। এছাড়াও কানামাছি,

বন্দি, কপাটি, অততপানি গুড়গুড়ানি, মাইচং, পাঞ্জা উল্লেখযোগ্য খেলা। খাসিদের খেলার মধ্যে তীর-ধনুক প্রতিযোগিতা, কুস্তি, সাইডিকুট এবং কানামাছি ও হাডুডুও প্রচলিত রয়েছে।

রাখাইন সমাজে লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে নিজেদের ভাষায় 'খ্যেৎ-ক্যাউছি' (ডাংগুলি জাতীয় খেলা), ক্র-নাঃ-ক্রং লাই-তেঃ (বিড়াল-ইঁদুর খেলা)' ইত্যাদি প্রচলিত খেলা। এখানে খেৎ-ক্যাউ-ছি খেলার বিবরণ দেওয়া হলো। এটা অনেকটা ডাং গুলি খেলার মতো। দুটি দলে সম সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। ছেলেরাই এ খেলার খেলোয়াড়। কাঠ বা গাছের ডাল থেকে এ খেলার উপকরণ ডাং ও গুলা তৈরি করা হয়। গুলার যে কোনো প্রান্তকে ডাং দিয়ে মৃদু স্পর্শ করার সাথে সাথেই উড়ন্ত গুলাকে প্রতিজন তিন বার করে খেলে। ডাং এর সাহায্যে দূরত্ব পরিমাপ করে নিজ দলের খেলোয়াড়দের দূরত্ব সমষ্টি করা হয়। যে দলে দূরত্ব বেশি হবে সে দল বিজয়ী হয়। বিজিত দলের খেলোয়াড়দেরকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়রা কান ধরে বা পিঠে উঠে জয়ের স্বাদ গ্রহণ করে। রাখাইন গ্রামে এ খেলা খুব জনপ্রিয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	'আথো আচ্ কে' কাদের খেলা? এ খেলার বিবরণ দাও।
কাজ- ২:	কোন খেলা 'পোলো' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **ককবোরক কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা?**

ক. চাকমা খ. মারমা

গ. গারো ঘ. ত্রিপুরা

২. **রূপকথায় প্রতিফলন ঘটে-**

i. মানুষের জীবনদর্শন

ii. সমাজের রীতিনীতি

iii. সৃজনশীল সাহিত্যচর্চা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাতানী গ্রামের আনসার গাইন কথায় কথায় জারিগান করেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর তিনি গানে গানে প্রদান করেন।

৩. **আনসার গাইনের তাৎক্ষণিক গানের সাথে কোন গানের সম্পর্ক আছে?**

ক. গীত খ. রে রে

গ. কীর্তন ঘ. কাপ্যা

৪. **আনসার গাইনের গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তার-**

i. জীবনের সাধারণ ঘটনাবলি

ii. ধর্মীয় ও সামাজিক দর্শন

iii. শৈল্পিক সৃজনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আনিস "রাজা হরিশচন্দ্র" যাত্রাপালাটি দেখছিল। উক্ত রাজা অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ছদ্মবেশী ব্রহ্মা তাকে পরীক্ষা করার জন্য দান হিসাবে রাজ্য চাইলে তিনি তা দেন এবং দক্ষিণা হিসাবে তার স্ত্রী পুত্রকে বিক্রি করে অর্থদান করেন। তিনি নিঃস্ব হয়ে শ্মশানে লাশ পোড়ানোর কাজ নেন। ইতোমধ্যে সাপের কামড়ে তার পুত্রের মৃত্যু হলে লাশ পোড়াতে হরিশচন্দ্রের অবিচলতা দেখে ব্রহ্মা তার রাজ্য, স্ত্রী এবং সন্তান ফেরত দেন।

ক. কসমতি চরিত্র কোন লোককাহিনীর অন্তর্ভুক্ত?

খ. রূপকথায় কিসের প্রতিফলন ঘটে? ব্যাখ্যা করো।

গ. রাজা হরিশচন্দ্র তোমার পাঠ্যপুস্তকের আগরতারার পৌরাণিকের কোন চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রাজা হরিশচন্দ্র যাত্রাপালা এবং আগরতারার পৌরাণিক গল্পটির মূলভাব এক ও অভিন্ন'- বিশ্লেষণ করো।

২. বনফুল স্কুলের তামান্না তার বান্ধবী মিরার গ্রামে বেড়াতে গেল। সেখানে সে ছেলেমেয়েদের সাথে লুকোচুরি খেলল। সে মিরার মাকে পরিবারে কর্তৃত্ব করতে দেখল। দুপুরে তামান্নাকে ভাত ও তেলহীন তরকারি খেতে দেওয়া হলো। সে তা খেতে পারল না।

ক. থেই খাং কিসের তৈরি বাদ্যযন্ত্র?

খ. কাং চৈ খেলা কীভাবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে?

গ. তামান্না যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাড়িতে বেড়াতে গেল তাদের পরিচয় দাও।

ঘ. তামান্নার সংস্কৃতির সাথে মিরার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো।